মধ্যপ্রাচ্যের বিপ্লবঃ শক্তি ও সম্ভাবনা

Written by ফিরোজ মাহবুব কামাল
Sunday, 27 March 2011 18:08 -

মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলি এতকাল পরিচিত ছিল তেল, গ্যাস ও অতি নিষ্ঠুর চরিত্রের স্বৈরাচারি শাসকদের কারণে। এখন পরিচিতি পাচ্ছে গণবিপ্লবের দেশরূপে। সমগ্র মধ্যপ্রাচ্য জুড়ে বইছে বিপ্লবের জোয়ার। এ বিপ্লব কোন সৈনিক, শ্রমিক, সমাজতন্ত্রি বা জাতিয়তাবাদীর বিপ্লব নয়, প্রকৃত অর্থেই এটি জনগণের বিপ্লব। বিশ্ববাসীর নজর এখন এসব দেশের বিপ্লবী জনগণের দিকে। সরকার পতনের দাবী নিয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষ নেমেছে রাস্তায়। সে দাবীর মুখে ইতিমধ্যেই পতন ঘটেছে তিউনিসিয়ার প্রেসিডেন্ট বিন আলী এবং মিশরের প্রেসিডেন্ট হোসনী মোবারকের মত শক্তিধর স্বৈরাচারী শাসকের। পতনের পথে ইয়েমেনের শাসক প্রেসিডেন্ট আব্দুল্লাহ সালেহ এবং বাহরাইনের রাজা হামাদ আল খলিফা। গণজোয়ার তীব্রতর হচ্ছে সিরিয়ার বশির আল আসাদ এবং সৌদি আরব ও জর্দানের রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধেও। নিরস্ত্র জনগনের লড়াই সশস্ত্র রূপ নিয়েছে লিবিয়ায়। হোসনী মোবারক বা বিন আলীর মত সেদেশের নিষ্ঠুর শাসক মোয়াম্মার গাদ্দাফী বিনা যুদ্ধে গদী ছাড়বার জন্য রাজী নয়। ট্যাংক ও যুদ্ধ-বিমান নিয়ে সে হামলা শুরু করেছে নিরস্ত্র জনগণের উপর।

মধ্যপ্রা্চ্যের এ বিপ্লব নিয়ে দেখবার বা ভাববার বিষয় যেমন অনেক, তেমনি শিখবার বিষয়ও অনেক। সমাজ পরিবর্তনের এ এক নতুন ইতিহাস। মানব জাতির ইতিহাসে এ এক নতুন অভিজ্ঞতা। এতকাল যে পথগুলি বেয়ে বিপ্লব হত, মধ্যপ্রাচ্যের এ বিপ্লব সে পথে হচ্ছে না। রাশিয়ার স্বৈরাচারি জারের বিরুদ্ধে বলশেভিক কম্যুনিষ্টগণ বিপ্লব এনেছিল রক্তাত্ব পথে। সে দেশে কম্যুনিষ্ট পার্টির কর্মীদের সাথে বিদ্রোহে যোগ দিয়েছিল শ্রমিক ও সৈনিকেরা। সে বিপ্লবে মারা গিয়েছিল হাজার হাজার মানুষ। মাও সে তুংয়ের নেতৃত্বে কম্যুনিষ্ট বিপ্লব এসেছিল চীনে। সে বিপ্লবেও হাজার হাজার মানুষের মৃত্যু ঘটেছিল। কম্যুনিষ্টগণ রাশিয়া ও চীনের বিপ্লবকে অভিহত করে শ্রেণী যুদ্ধ রূপে, অর্থাৎ এক শ্রেণীর যুদ্ধ আরেক শ্রেণীর বিরুদ্ধে। কিন্তু০ মধ্যপ্রাচ্যের এ বিপ্লবে এক কাতারে শামিল হয়েছে দেশের সর্বশ্রেণীর মানুষ। এখানে জনগণের মাঝে কোন যুদ্ধ নেই। সমাজবিজ্ঞানীদের কাছে আজ এ বিপ্লব এক গভীর গবেষণার বিষয়। এ বিপ্লবের শক্তির উৎস কি, সম্ভাবনা বা শিক্ষণীয় দিকই বা কি – আলোচ্য নিবন্ধেরও এটিই হল মূল বিষয়।

অতীতের সকল বিপ্লব থেকে মধ্যপ্রাচ্যের এ বিপ্লবের বড় পার্থক্য হল, এ বিপ্লবের পিছনে কোন কেন্দ্রীয় নেতা নেই, কোন সংগঠনও নেই। মিশর, তিউনিসিয়া, ইয়েমেন, বাহরাইন, সিরিয়া, লিবিয়াসহ সর্বত্র একই অবস্থা। প্রতিটি দেশে

1 / 8

মধ্যপ্রাচ্যের বিপ্লবঃ শক্তি ও সম্ভাবনা

Written by ফিরোজ মাহবুব কামাল
Sunday, 27 March 2011 18:08 -

বিপ্লব গড়ে তুলেছে এবং সম্মিলিত নেতৃত্ব দিয়েছে শিক্ষীত যুব সম্প্রদায়। নিজেদের মধ্যে তারা সুদৃঢ় ঐক্য গড়েছে, এক সাথে তারা ময়দানে নেমেছে, সারা দেশব্যাপী একই সুরে ও একই ভাষায় কথা বলেছে। কোন সংগঠনের কর্মী না হয়েও শত শত শহরের লক্ষ লক্ষ মানুষ যে কিভাবে এতটা সুশৃঙ্খল ভাবে সংগঠিত হতে পারে এবং একই ভাষায় ও একই স্ট্রাটেজী নিয়ে ময়দানে অটল থাকতে পারে সেটি এক বিস্ময়ের বিষয়। গণ-আন্দোলনের ইতিহাসে এ এক নতুন অভিজ্ঞতা। কায়রোর তাহরির ময়দানে বা তিউনিসিয়ার রাজপথে প্রবল স্বৈরাচারি শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধজয়ের যে ইতিহাস নির্মিত হল সেটি নিঃসন্দেহে মানব ইতিহাসের বহু বড় যুদ্ধের চেয়েও অধিক সমুজ্জ্বল হয়ে থাকবে। বিপ্লবের এ এক নতুন মডেল। বিশ্বের নানা দেশে সরকার পতনের আন্দোলনে এ মডেল নিঃসন্দেহে অনুপ্রেরণা জোগাবে।

বিশ্বের সকল স্বৈরাচারি সরকারের স্ট্রাটেজী এক ও অভিন্ন। তাদের কাছে প্রধান শত্রু রূপে চিহ্নিত হয় জনগণ। তাদের প্রধান রণপ্রস্তুতিও তাই জনগণের বিরুদ্ধে। গাদ্দাফী তাই দেশের সীমান্তে একখানি ট্যাংক মোতায়েন না করলে কি হবে, বহু ট্যাংক দিয়ে ঘেরাও করেছিল বেনগাজিসহ লিবিয়ার শহরগুলিকে। একই ভাবে হোসনী মোবারক ট্যাংক মোতায়েন করেছিল তাহরির ময়াদানে। মুজিবামলেও তাই বাংলাদেশে সীমান্ত অরক্ষিত হলে কি হবে, গ্রাম-গঞ্জে রক্ষিবাহিনীর হাজার হাজার সেপাই নেমেছিল রাজনৈতিক বিরোধীদের নির্মূলে। জনগণকে শক্তিহীন করার লক্ষ্যে স্বৈরাচারিদের অভিন্ন স্ট্রাটেজী হল, তাদেরকে নেতৃত্বহীন, সংগঠনহীন ও যোগাযোগহীন করা। কেড়ে নেয় রাজনৈতিক মত প্রকাশের স্বাধীনতা। তারা কড়া নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে জনগণের চিন্তা-ভাবনার উপর। আর সে কৌশলই দীর্ঘকাল কঠোর ভাবে বাস্তবায়ীত হয়ে আসছে মধ্যপ্রাচ্যে। স্বৈরাচার-অধিকৃত মধ্যপ্রাচ্যের এ দেশগুলিতে মদের দোকান, জুয়ার ঘর, নাচগানের ক্লাব এবং পতিতাপল্লি প্রতিষ্ঠার লাইসেন্স অবাধে বিতরণ করা হলেও জনগণকে অনুমতি দেয়া হয়নি ইচ্ছামত রাজনৈতিক দলগড়ার। ফ্যাশান, যৌনতা বা অশ্লিলতার প্রচারে পত্রিকা বের করার অনুমতি মিললেও অনুমতি দেয়া হয়নি রাজনৈতিক বক্তব্য নিয়ে পত্রিকা প্রকাশের। এদের কাছে রাজনৈতিক বিরোধী মানেই নিপীড়নযোগ্য, বন্দীযোগ্য, এমনকি বধযোগ্য শত্রু। মিশরে স্বৈরাচারি হোসনী মোবারক তাই ইখওয়ানূল মুসলিমীনের ন্যায় বহু শান্তিবাদী ও নিয়মতান্ত্রিক সংগঠনকে এক দিনের জন্যও আইনগত বৈধতা দেয়নি। একই রূপ আচরন ছিল হোসনী মোবারেকের পূর্বের সরকারগুলোর। হত্যা করা হয়েছে বা কারারুদ্ধ করা হয়েছে এ দলটির বহু নেতাদের। একই ভাবে তিউনিসিয়ায় নিষিদ্ধ করা হয় রশিদ ঘানুশির আন নাহাদা পার্টিকে। জেলে ঢুকানো হয় এ দলের হাজার হাজার কর্মীর।

হোসনী মোবারক তার পুরা শাসনকাল ধরেই জারি রেখেছিলেন জরুরী আইন। সে আইন সরকারকে দিয়েছিল যে কোন ব্যক্তিকে বিনা বিচারে যে কোন মেয়াদে গ্রেফতারের অধিকার। সিরিয়াতে জরুরী আইন বলবৎ রয়েছে ১৯৬৩ সাল থেকে। স্বৈরাচা্রি শাসনের বড় বিপদ এবং সে সাথে বড় আযাব হল, তারা শুধু জনগণের স্বাধীনতাই হরণ করে না বা নিজেরাই শুধু দুর্বৃত্ত ও সন্ত্রাসী রূপে আত্মপ্রকাশ করে না, বরং প্রশ্রয় দেয় অন্যদেরও দুর্বৃত্ত ও সন্ত্রাসী রূপে বেড়ে উঠতে। ফলে দেশ পূর্ণ হয়ে উঠে সন্ত্রাস ও নানারূপ দুর্বৃত্তিতে। স্বৈরাচার-কবলিত দেশে সরকারের লেজুড়বৃত্তি শুধু দেশের প্রশাসন, পুলিশ বা গোয়েন্দা বাহিনীর সেপাইগণ করে না, বরং জল্লাদ রূপে কাজ করে দেশের নিম্ন ও উচ্চ আদালতের বিচারকগণও। তাই মিশরের আদালত যেমন সৈয়দ কুতুবের ন্যায় ব্যক্তিকে ফাঁসীতে ঝুলিয়েছে, তেমনি তিউনিসিয়ায় জনাব রশিদ ঘানুশিকে যাবৎ-জীবন কারাবাসের শাস্তিও শুনিয়েছে। তবে রশিদ ঘানুশির সৌভাগ্য, তিনি ব্রিটেনে রাজনৈতিক আশ্রয়ে ছিলেন।

2 / 8

মধ্যপ্রাচ্যের বিপ্লবঃ শক্তি ও সম্ভাবনা

Written by ফিরোজ মাহবুব কামাল
Sunday, 27 March 2011 18:08 -

যে কোন মহৎ বিপ্লবের মূল শক্তিটা হল তার দর্শন বা ফিলোসফি। দর্শনই কর্মে, ত্যাগে ও বিপ্লবে ব্যক্তিকে উদ্বুদ্ধ করে। যেখানে সে দর্শনটি অতি প্রবল সেখানে জনগণকে উদ্বুদ্ধ বা সংগঠিত করার জন্য কোন শক্তিশালী সংগঠন বা নেতার প্রয়োজন পড়ে না। জনগণ তখন ময়দানে নামে নিজ নিজ দায়িত্ববোধে। জনগণ তখন নিজ থেকেই প্রতিষ্ঠিত করে সম্মিলিত নেতেৃত্বের। সক্রেটিসের আমলে গ্রীসে যে গণতান্ত্রিক নগর রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা ঘটেছিল তখনও একটি দর্শন-সমৃদ্ধ চেতনা কাজ করেছিল। তেমনি হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)য়ের ওফাতের পর যে খেলাফা পদ্ধতি গড়ে উঠেছিল তার পিছনেও ইসলামী দর্শন কাজ করেছিল। দর্শন প্রাধান্য পায় সেটি রাজতন্ত্র বিদায় নিয়েছিল। ফলে নবীজী(সাঃ)র ন্যায় বিশ্বশ্রেষ্ঠ নেতার ইন্তেকালের পরও বিপর্যয় দেখা দেয়নি। শক্তিশালী নেতা ও সংগঠনের বড় প্রয়োজন তো ট্রাইবাল সমাজে। ভেড়ার পাল যেমন রাখাল ছাড়া সামনে চলে না, শিক্ষাদীক্ষায় অনুন্নত সমাজও তেমনি বলিষ্ঠ নেতা ছাড়া সামনে এগুয় না। জনকল্যাণকর বিপ্লবের তাই শর্ত হল, সাধারণ মানুষের মাঝে জ্ঞানের ব্যাপক প্রসার। ইসলামে জ্ঞানার্জন তাই ফরজ। মনরাজ্যে অন্ধকার নিয়ে জনকল্যাণকর বিপ্লব অসম্ভব। তখন বরং সাপ-শকুন, পাহাড়-পর্বত, গরু-ছাগলও ভগবান মনে হয়। গোমূত্র বা গোবরও পবিত্র গণ্য হয়। মিশরবাসীর কাছে ফেরাউনের ন্যায় বর্বর স্বৈরাচারিও খোদা বলে স্বীকৃতি পেয়েছিল তো একারণেই। এই হল, অজ্ঞতার শক্তি। স্বৈরাচারি দুর্বৃত্তদের কাছে অজ্ঞতা এজন্যই এত প্রিয়। এমন অজ্ঞতার কারণেই শেখ মুজিবের ন্যায় একদলীয় বাকশালী শাসনের জনক এবং এক ভয়ানক দুর্ভিক্ষের আয়োজকও তাঁর অনুসারিদের কাছ থেকে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী রূপে গণ্য হন। এমন অজ্ঞতা নিয়ে জনগণের মানবিক অধিকার প্রতিষ্ঠা কি সম্ভব?

স্বৈরাচার মাত্রই সন্ত্রাসী। রাস্তার সন্ত্রাসী অস্ত্র দেখিয়ে পথযাত্রীর অর্থ কাড়ে। আর সন্ত্রাসী শাসক ভয় দেখিয়ে কেড়ে নেয় জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার। সে ভয় দেখায় আদালত, পুলিশ ও রক্ষিবাহিনীর। তবে স্বৈরাচারের সবচেয়ে সন্ত্রাসটি শুধু রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে নয়, বরং সেটি জ্ঞানী ও সুস্থ্য জ্ঞান বিতরনের বিরুদ্ধে। জ্ঞানই শক্তি। তাই স্বৈরাচারি শাসক জনগণের শক্তি খর্ব করতে তাদেরকে জ্ঞানহীন করে। তাই স্বৈরাচারি সরকার শুধু বিরোধী রাজনৈতিক নেতাদের হত্যা বা তাদের দলকেই নিষিদ্ধ করে না, নিষিদ্ধ করে স্বাধীন লেখালেখি ও প্রকাশনাকেও। তারা চায়, জ্ঞান-বিতরণ সীমিত হোক এবং প্রচারিত জ্ঞাননের বিষয়গুলো তাদের পক্ষে হোক। রেডিও-টিভি ও পত্র-পত্রিকার উপর এজন্যই তাদের কঠোর নিয়ন্ত্রন। জ্ঞান বিতরণের অত্যাধুনিক মাধ্যম হল ইন্টারনেট। ইন্টারনেট সংযোগ গড়ে দেশের ও বিশ্বের নানা কোণের জ্ঞানবান মানুষের সাথে। কিন্তু স্বৈরাচারি শাসকদের কাছে জ্ঞানের এমন বিতরণ পছন্দীয় নয়। তাই বিপ্লব শুরুর সাথে সাথে মধ্যপ্রাচ্যের সকল স্বৈরাচারি শাসকগণ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করেছিল ইন্টারনেটের সাথে। নিষিদ্ধ করেছিল আল-জাজিরার ন্যায় টিভি চ্যানেলকেও।

3 / 8

মধ্যপ্রাচ্যের বিপ্লবঃ শক্তি ও সম্ভাবনা

Written by ফিরোজ মাহবুব কামাল
Sunday, 27 March 2011 18:08 -

মধ্যপ্রাচ্যের এ বিপ্লবে অতি প্রবল ভাবে যা প্রকাশ পেল তা হল জনগণের শক্তি। জনগণের শক্তির কাছে সরকারের শক্তি যে কতটা তুচ্ছ ও অসহায় সেটিও এ বিপ্লব চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল। প্রতিটি ব্যক্তি পেয়েছে প্রচন্ড আত্মবিশ্বাস। জনতার শক্তি রাষ্ট্রের ইতিহাস পাল্টে দিতে পারে। জনগণের শক্তির মূলে হল তাদের একতা। মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলিতে সে একতা সৃষ্টির পিছনে একদিকে যেমন কাজ করেছে ইসলামের বিপ্লবী দর্শন, তেমনি স্বৈরাচারি শাসকদের হাতে সংঘটিত ভয়ানক কুকর্ম ও অনিষ্টতার ধারণা। গ্রামে ডাকাত ঢুকলে বা প্রতিবেশীর ঘরে আগুণ লাগলে জনতাকে ঘরের বাইরে আনতে ওয়াজ নসিহতের প্রয়োজন পড়েনা। গ্রামবাসী তখন নিজ দায়িত্ববোধে হাতের কাছে যা পায় তা নিয়েই ঘর থেকে দ্রুত বেড়িয়ে আসে। অনুরূপ ঘটনা ঘটে যখন দেশ বিপদে পড়ে। আর দেশের জন্য সে বিপদ ঘটায় তো স্বৈরাচারী শাসক। স্বৈরাচারী মাত্রই দুর্বৃত্ত, তবে তাদের দৃর্বৃত্তিটা চোর-ডাকাত বা সন্ত্রাসীদের থেকে ভিন্নতর। তাদের দুর্বৃত্তি সমগ্র দেশ ও দেশবাসীর বিরুদ্ধে। তারা শুধু দেশের সম্পদই লুন্ঠন করেনা, লুন্ঠন করে জনগণের স্বাধীন ভাবে বাঁচার অধিকার। স্বৈরাচারি শাসক এভাবে দেশবাসীর ইজ্জতে হাত দেয়। দেশকে পরিণত করে জেলখানায়। দুর্বৃত্ত শাসকদের এমন দুর্বৃত্তিই জনগণকে একতাবদ্ধ করার জন্য যথেষ্ট। তাই মিশর, তিউনিসিয়া, ইয়েমেন, বাহরাইন, সিরিয়া, জর্দান ও লিবিয়ার মত দেশগুলোতে জনগণকে একত্রিত করার জন্য তাই কোন নেতা বা দলের পক্ষ থেকে ডাক দেয়ার প্রয়োজন পড়েনি। নিরস্ত্র বিক্ষোভকারীদের উপর গুলি বর্ষণ, নিরপরাধ মানুষ হত্যা, তাহরীর স্কোয়ারে উট ও ঘোড়ার পিঠে চড়িয়ে সশস্ত্র গুন্ডা নামিয়ে দেয়া, গুন্ডাদের দিয়ে নিরস্ত্র মানুষ খুণ করা – এরূপ দুষ্কর্মই দুর্বৃত্ত স্বৈরাচারির আসল রূপ তুলে ধরার জন্য যথেষ্ট ছিল। তবে এজন্য প্রয়োজনীয় ছিল জনগণের কাছে হত্যা ও নির্যাতনের সচিত্র ঘটনাগুলো অবিকল ভাবে মানুষের সামনে তুলে ধরা। কারণ, হত্যার ন্যায় বর্বর কর্মটিও হত্যা রূপে গণ্যই হয় না -যদি না সেটি প্রকাশ পায়। খুণের ঘটনা যদি কেউ না জানে তবে সে খুণকে কে খুণ বলবে? তখন সে খুণিকে আদালতে হাজির করা যায় না, শাস্তিও দেয়া যায় না। তার বিরুদ্ধে তখন গণরোষও জাগেনা। এজন্যই চোর যেমন গোপনে চুরি করে, স্বৈরাচারি সরকারগুলোও তেমনি অতি সংগোপনে নির্যাতন করে ও মানুষ খুণ করে। এবং শত শত খুণের পর গলা উঁচিয়ে বলে, সরকার কারো উপর কোন নির্যাতন করেনি। খুণও করেনি। এভাবে নিজেদেরকে তারা ফেরেশতা রূপে জাহির করে। কিন্তু বিশ্ব আজ পাল্টে গেছে। মবাইল ক্যামেরা, ভিডিও ক্যামেরা, টিভি ক্যামেরার মাধ্যমে মানুষ এখন নিরস্ত্র জনতার উপর সরকারী বাহিনীর নির্যাতন, গুলিবর্ষন, হত্যা, ও নানারূপ বর্বরতার ছবি তুলতে সমর্থ হচ্ছে। ইউটিউব, টিভি, ফেসবুক, টুইটারের মাধ্যেমে বিশ্বব্যাপী সেগুলোকে ছড়িয়ে দিতে পারছে। ফলে সারা বিশ্বের মানুষ এখন বর্বর শাসকদের দুর্বৃত্তিগুলো স্বচোখে দেখছে। আর একমাত্র খুণি ছাড়া খুণকে কে না ঘৃনা করে? তখন সে ঘৃণা নিয়েই মানুষ খুণিদের বিরুদ্ধে ময়দানে নামে। এ বিপ্লবে তো সেটিই হয়েছে। অপর দিকে ঈমানদারগণ এ খুণিদের হটানোকে জিহাদী দায়িত্ব মনে করেছে।

মধ্যপ্রাচ্যের বিপ্লবগুলি দেখিয়ে দিল, একজন সাধারণ মানুষও রাজপথে নামার মধ্য দিয়ে সরকার পবিবর্তনে কীরূপ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। প্রমাণ করল, অস্ত্রের বল কলমের বলের কাছে কত তুচ্ছ। সমাজ বিপ্লবে একজন লেখকও যে নীরবে কতবড় বিশাল ভূমিকা রাখতে পারে সেটিও প্রকাশ পেল। আধুনিক প্রযুক্তিও বিপ্লবীদের শক্তিকে প্রচন্ড ভাবে বাড়িয়েছে। একজন তরুণ লেখক ইউরোপের কোন শহরের ছোট্ট এক কামরায় বসে কাঁপন ধরিয়ে দিচ্ছে সমগ্র আরব বিশ্বে। ইন্টারনেট ব্লগ, ফেসবুক, টুইটার –এসব নতুন প্রযুক্তি চিন্তাশীল মানুষের হাতে অতি শক্তিশালী অস্ত্র তুলে দিয়েছে। পূর্বে তাঁকে তাঁর লেখা প্রকাশের জন্য কোন পত্রিকার সম্পাদকের কাছে ধর্না দিতে হত। সম্পাদকের রাজনৈতিক বিশ্বাস, ধর্মীয় চেতনা ও মেজাজের দিকে নজরে রেখে তাঁকে লিখতে হত। অথবা নিজ অর্থ ব্যয়ে ও নিজ উদ্যোগে বই রূপে প্রকাশ করতে হত। এখন সে প্রয়োজন নেই। অতি অল্প খরচে সে এখন তাঁর লেখাকে সারা বিশ্বের পাঠকদের কাছে মুহুর্তের মধ্যে পৌঁছাতে পারছে। ইন্টারনেটের এ এক অভাবনীয় অবদান। কোন স্বৈরাচারি শাসকের পক্ষে এখন আর সম্ভব নয় তাঁর কন্ঠরোধ করা। সত্য কথা বলতে গিয়ে ইসলামের নবীকেও পাথরবিদ্ধ হতে হয়েছে। দেশ ত্যাগ করতে হয়েছে। কিন্তু এখন সে বাধা নেই। মানব জাতির ইতিহাসে এ এক অভূতপূর্ব অধ্যায়। ফলে

4 / 8

মধ্যপ্রাচ্যের বিপ্লবঃ শক্তি ও সম্ভাবনা

Written by ফিরোজ মাহবুব কামাল
Sunday, 27 March 2011 18:08 -

মিথ্যার বিশাল পাহাড় এখন দ্রুত বিলীন হয়ে যাচ্ছে। সত্য-সৈনিকদের জন্য এ এক মহা সম্ভাবনার দিন। শত শত তরুন লেখক এখন আধুনিক প্রযুক্তি থেকে ফায়দা নিচ্ছে। অনেকে তো এ বিপ্লবকে বলছে ফেসবুক ও টুইটারের বিপ্লব।

মধ্যপ্রাচ্যের বিপ্লবে অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে আল-জাজিরার আরবী ও ইংরেজী টিভি নেটওয়ার্ক। মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে এটিই হল সবচেয়ে জনপ্রিয় চ্যানেল। এ টিভি চ্যানেলে তেমন বিজ্ঞাপণ নাই, এবং প্রচার চলে ২৪ ঘন্টা ধরে। খবর, খবরের উপর বিশ্লেষন, জ্ঞানমূলক আলোচনা এবং নানা মতের মানুষের চুলচেরা বিতর্ক। প্রায় প্রতিটি অনুষ্ঠানই অতি জনপ্রিয়। বিশ্বের আর কোন চ্যানেলে এত স্বাধীন ভাবে এমন জ্ঞানগর্ভ আলোচনা হয় না। বিবিসি, সিএনএনসহ কোন চ্যানেলই আল-জাজিরার সমকক্ষ নয়। এক কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, আর কোন দিকে না হোক, অন্ততঃ সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে আরব বিশ্ব সমগ্র বিশ্বকে শ্রেষ্ঠতর কিছু শেখানোর যোগ্যতা রাখে। এবং সেটি আল-জাজিরার হাত দিয়ে। নিঃসন্দেহে এ কথাও বলা যায়, আল-জাজিরা হল আরব বিশ্বের সবচেয়ে সফল বিশ্ববিদ্যালয়। এ টিভি চ্যানেলের অধিকাংশ আলোচনাই যেন বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসরের জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা। ইংরেজীর চেয়েও সমৃদ্ধ এদের আরবী চ্যানেল। স্বৈরাচারি শাসকদের দ্বারা অধিকৃত হওয়ার কারণে দেশ ত্যাগে বাধ্য হয়েছেন আরব বিশ্বের বিপুল সংখ্যক লেখক, সাংবাদিক, কলামিস্ট, বুদ্ধিজীবী ও রাজনীতিবিদ। তাদের বসবাস এখন ইউরোপ-আমেরিকার বিভিন্ন শহরে। অনেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কেউবা গবেষক। কেউবা গড়ে তুলেছেন প্রসিদ্ধ গবেষণা প্রতিষ্ঠান। অনেকে কলাম লিখছেন বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায়। আল-জাজিরার অবদান, এসব প্রবাসী বুদ্ধিজীবীগণ পেয়েছেন স্বাধীন ভাবে কথা বলার মঞ্চ। আল-জাজিরার জনপ্রিয়তার মূল কারণও হল এসব জ্ঞানী ব্যক্তিদের অংশগ্রহন। স্বৈরাচারি শাসকদের পায়ের তলা থেকে মাটি সরিয়ে দিয়েছেন তারা। সমগ্র মধ্যপ্রাচ্য জুড়ে তারা গড়ে তুলেছেন প্যান-আরব ও প্যান-ইসলামিক চেতনা। ফল দাঁড়িয়েছে, এ বিপ্লব এখন আর শুধু একটি দেশে সীমাবদ্ধ নয়। বরং একই রং, একই ভাষা এবং একই চরিত্র নিয়ে ছড়িয়ে পড়েছে মধ্যপ্রাচ্যের প্রায় সকল দেশে।

ক্যাডারভিত্তিক বা দলভিত্তিক আন্দোলনের মাধ্যমে যারা বিপ্লবের স্বপ্ন দেখেন এ বিপ্লবে তাদের জন্যও রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা। তবে তাদের জন্য এ বিপ্লবের শিক্ষাটি আদৌ সুখকর নয়। মিশর ও তিউনিসিয়াসহ কোন দেশেই কোন দলীয় ক্যাডার বা দলের হাতে এ বিপ্লব জন্ম নেয়নি। তাদের দ্বারা এ বিপ্লব নিয়ন্ত্রিতও হয়নি। বরং এক পর্যায়ে মিশরে ইখওয়ানুল মুসলিমেনের নেতাদের সাথে তাহরির ময়দানে সমবেত জনতার মতানৈক্যও দেখা দেয়। বিপ্লব যখন বিজয়ের দ্বারপ্রান্তে এবং হোসনী মোবারক যখন পালাবার রাস্তা খুঁজছে, তাহরীর ময়দান থেকে যখন সরকারের সকল আপোষ প্রস্তাবকে বয়কট করা হচ্ছে ঠিক এ মুহুর্তেই ইখওয়ানের কিছু নেতা হোসনে মোবারক কর্তৃক সদ্য নিয়োগপ্রাপ্ত ভাইস প্রেসিডেন্ট উমর সুলাইমানের সাথে বৈঠক করে। এতে তাহরির ময়দানের যুবকগণ এতটাই বিক্ষুব্ধ হয় যে, তারা ঘোষণা দিয়ে জানিয়ে দেয়, “এরা আমাদের লোক নয়।” দল ভিত্তিক আন্দোলনের বড় দুর্বলতা হল, দলের লাভ-লোকসান ও বিজয়কে তারা বড় করে দেখে। ফলে তারা ব্যর্থ হয় নানা মতের নানা মানুষের সাথে ঐক্য গড়তে। ফলে অন্য সবাইকে নিয়ে গণবিপ্লবে তারা একাত্ম হতে পারে না। বিপ্লব কোন দলের নয়, কোন নেতারও নয়। এটি সমগ্র দেশবাসীর। ফলে দলীয় বা ক্যাডারভিত্তিক চেতনা বিপ্লবের পথে বড় বাধা। বিপ্লবের জন্য জরুরী হল, লড়াইয়ের ময়দানে অন্যদের সাথে একতা। ইসলামে এমন একতা ফরয। নদীর দুই পাশে মজবুত বাঁধ দিলে নদীর পানি তাতে সহজে বশে আসে। কিন্তু সে নদী পাড়-ভাসা প্লাবন দেয় না, ফলে আশে পাশের মাঠঘাটও তখন বানের পানিতে ভাসে না। আবার বিল-ঝিলের পানিকেও নদীতে নামতে দেয়না। তেমনি অবস্থা ক্যাডার ভিত্তিক সংগঠনের। এতে সংঠন মজবুত হয়, সংগঠনও দীর্ঘায়ু পায়, কিন্তু তাতে সাধারণে জনগণের

5 / 8

মধ্যপ্রাচ্যের বিপ্লবঃ শক্তি ও সম্ভাবনা

Written by ফিরোজ মাহবুব কামাল
Sunday, 27 March 2011 18:08 -

সাথে জনগণের সংযোগটা বাড়ে না। ক্যাডারগণ কাজ করে দলের গেটকিপার বা প্রহরীর রূপে। ফলে যত ইসলামী বা বিপ্লবীই হোক, দলের সদস্য না হলে তাকে দলের বাইরেই অবস্থান করতে হয়। এতে বিভাজন বাড়ে। ফলে ক্যাডারদের দ্বারা দলে লাঠিয়ালের সংখ্যা বাড়লেও বিপ্লবের সম্ভাবনা বাড়ে না। তাই বহু মুসলিম দেশে ক্যাডার ভিত্তিক সংগঠনের সংখ্যা ও বয়স বাড়লেও তাদের দ্বারা এ অবধি কোন বিপ্লব আসেনি। ভবিষ্যতেও সে সম্ভাবনা ক্ষীণ। দলকে মজবুত করতে গিয়ে মিশরে ইখওয়ানুল মুসলিমীনের বহু নেতাকর্মী হোসনী মোবারকের সরকারের সাথে নানা দ্বন্দ সত্ত্বেও কিছু সুসম্পর্ক গড়েছিল। সরকারী দলের বহু নেতাদের সাথে সহযোগিতার মাধ্যমেই দলটির বহু ক্যাডার ও নেতা গড়ে তুলেছে বিশাল অর্থনৈতিক সাম্রাজ্য। মিশরের বড় বড় মোবাইল কোম্পানীর মালিক হল তারা। তারা এখন বিলিয়োনীয়ার। এমন ধনকুবেরগণ কি কোন গণবিপ্লবে শরীক হতে পারে? রাষ্ট্র বা সমাজ কল্যাণ বলতে তারা যা বোঝে সেটি হল, কিছু মসজিদ-মাদ্রাসা, ইয়াতিম খানা ও হাসপাতাল নির্মাণ। বড় জোর নির্বচনে অংশগ্রহন। বিপ্লব তাদের কাছে গণ্য হয় গোলযোগ বা অস্থিরতা রূপে। আর এমন অস্থিরতায় তারা অকল্যাণ দেখে নিজেদের ব্যবসা-বাণিজ্যের। ফলে স্বভাবতই তারা বিপ্লব বিরোধী হয়। তাছাড়া মধ্যপ্রাচ্যে হোসনী মোবারক ছিল মার্কিনীদের লোক। শেষ দিন পর্যন্ত তারা তার কল্যাণই চেয়েছে। ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ পাশ্চাত্য দেশগুলোর চোখে বিপ্লবী বা মৌলবাদী রূপে চিত্রিত হওয়ার ভয়টাও ইখওয়ান নেতাদের মনে ছিল প্রচন্ড। বিপ্লবীদের সাথে তাঁরা জোয়ারে ভাসা শুরু করলেও সে ভয়ের কারণে তাঁরা সামনে আসেনি। তাদের ভয় ছিল, না জানি বিপ্লব ব্যর্থ হয়ে যায়। এমন এক দোটানা অবস্থায় হোসনী মোবারকের পতিতপ্রায় সরকারের কাছ থেকে যখন আলোচনার দাওয়াত পেল তখন সেখানে তাঁরা ছুঠে গিয়েছিল। এমন অবস্থা শুধু মিশরের ইখওয়ানুল মুসলিমীনের একার নয়। অন্যান্য মুসলিম দেশেও যেখানে ইসলামপন্থি দল সেক্যুউলার শক্তির সাথে সমোঝোতা গড়ে দলীয় শক্তি বাড়ানোর চেষ্টা করেছে, পরিণতিটা সেখানেও ভিন্নতর হয়নি।

এ বিপ্লবের পর এখন প্রচন্ড ভাবে দায়ভার বাড়লে বিশ্বের নানা দেশের মজলুম জনগণের। স্বৈরাচারি শাসকের সামনে দাঁড়িয়ে এখন আর অসহায়ের মত সেটি সহ্য করার কোন অজুহাতই থাকলো না। তাদের সামর্থ ও সম্বল তিউনিসিয়া, মিশর, লিবিয়া, ইয়েমেন, বাহরাইনের সাধারণ মানুষের চেয়ে কম নয়। ফলে তাদের ন্যায় তারাও যে কিছু করার সামর্থ রাখে সেটি কি আর অস্বীকারের উপায় আছে? এখন সেটি সহ্য করাই তাদের অযোগ্যতা। সে সাথে এটি দায়িত্ব পালন না করার মহা অপরাধও। এমন অযোগ্যতা কি কোন জনগণের জীবনে সম্মান, বিজয় বা কল্যাণ আনে? তিউনিসিয়া ও মিশরে বিপ্লবের এক ধাপ সম্পন্ন হয়েছে, তবে বিপ্লবের কাজ এতে শেষ হয়নি। স্বৈরাচারের আবর্জনা মাথা থেকে নামানোর কাজটা কেবল সমাধা হয়েছে মাত্র। মুসলমানের জন্য লড়াইটা এখন ইসলাম প্রতিষ্ঠার। স্বৈরাচারের উপস্থিতিতে এ কাজটা ছিল অতি কঠিন। তবে তাদের অপসারণের পরও এ কাজটি একেবারে সহজ হয়ে যায়নি। তবে যারা অতি নিষ্ঠুর, অতি শক্তিশালী ও শয়তানের অতি ঘনিষ্ঠ সহচরকে হটাতে পারে, তাদের কাছে কি শয়তানের ছোট ছোট অনুসারিদের হঠানো কি কঠিন? তবে বীজ বুনলেই ফসল প্রতিবার ঘরে উঠে না, অনাবৃষ্টি বা অতিবৃষ্টিতে বহুবার মারাও যায়। কিন্তু কৃষকের কাজ লাগাতর কৃষির কাজ চালিয়ে যাওয়া। তেমনি মুসলমানের কাজও বিপ্লবের কাজ চালিয়ে যাওয়া। এরূপ বিপ্লব নিছক রাজনীতি নয়, তেমনি পেশাও নয়। মুসলমানের কাছে এটি ইবাদত। আর সে ইবাদত নামায-রোযার মত নিছক কোন বিশেষ মাস বা বিশেষ ওয়াক্তেরও নয়। বরং আজীবনের এবং সর্বমুহুর্তের।

স্বৈরাচার মাথা থেকে নামানো হলেও তাদের হাতে গড়া বহু দিনের প্রতিষ্ঠিত সিস্টেমটি এখনও রয়ে গেছে। রয়ে গেছে স্বৈরাচারের সহচরগণও। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর সেদেশটি প্রতিষ্ঠার মূল লক্ষ্যটিই বানচাল হয়ে যায়। সেটি হয়

6 / 8

মধ্যপ্রাচ্যের বিপ্লবঃ শক্তি ও সম্ভাবনা

Written by ফিরোজ মাহবুব কামাল
Sunday, 27 March 2011 18:08 -

ব্রিটিশের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত আমলা, আর্মি অফিসার ও রাজনীতিবিদদের হাতে। তারাই ছিল ঔপনিবেশিক ব্রিটিশদের অতি নিষ্ঠাবান সেবক। তাই যারা ইসলামের প্রতিষ্ঠা চায় তাদের দায়িত্বটা এখন বিশাল। সে দায়িত্ব এখন সকল ইসলামপন্থির একতাবদ্ধ হওয়ার। এ দায়িত্ব নিছক কোন দলের নয়, কোন নেতারও নয়। বরং প্রতিটি ঈমানদারের। কোন দলভিত্তিক বা ক্যাডার ভিত্তিক চেতনা এ বিপ্লবের জন্য ক্ষতিকর। কারণ সে চেতনা অন্যকে বন্ধু হিসাবে নয়, প্রতিদ্বন্দী বা শত্রু হিসাবে ভাবতে উদ্বুদ্ধ করে। ইরানের বিপ্লব আজও বেঁচে আছে কোন ক্যাডার ভিত্তিক বা দলভিত্তিক চেতনা না থাকার কারণে। খেলাফায়ে রাশেদা যতদিন বেঁচেছিল সেটিও তো দ্বীনের প্রতি প্রচন্ড দায়িত্ববোধের কারণে, ফেরকা বা ক্যাডার ভিত্তিক চেতনার কারণে নয়। অথচ পাকিস্তান প্রতিষ্টার পর মুসলিম লীগের পুরা প্রজেক্টটি ব্যর্থ হয়েছে দল ভিত্তিক চেতনাকে প্রাধান্য দেয়াতে। আওয়ামী লীগের মত মুসলীম লীগও মনে করত দেশ তাদের নিজ-অর্জিত তালুক। তারা প্রাধান্য দেয়নি ইসলামী ভাতৃত্ব ও দায়িত্ববোধের বিষয়টি। ১৯৪৭ সালের পর অন্যদের দলে টানা দূরে থাক, তারা এমন কি নিজ দলের নেতা-কর্মীদেরও দলে রাখতে পারিনি। ঈমানদার হওয়ার অর্থ, দর্শকের গ্যালারিতে বসে নীরবে রাজনীতির খেলা দেখা নয়। বরং সেটিকে, জিহাদ গণ্য করে নিজ অর্থ, সামর্থ ও রক্তের বিণিয়োগ। সমাজ ও রাষ্ট্র জুড়ে ইসলাম প্রতিষ্ঠা পায় এবং বেঁচে থাকে তো ঈমানদারদের সে বিণিয়োগের ফলেই। অথচ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর সে বিণিয়োগটা হয়নি, বরং দেশটি খেলনায় পরিনত হয় সেক্যুউলারিষ্ট, সোসালিস্ট ও জাতিয়তাবাদী শত্রুদের হাতে। অবশেষে সে শত্রুদের হাতেই দেশটি ভেঙ্গে যায়। মধ্যপ্রাচ্যের বিপ্লবের আশাপ্রদ দিক হল, হোসনী মোবারক ও বিন আলী গদি ছাড়লেও বিপ্লবীরা রাজপথ ছাড়েনি। তারা কঠোর দৃষ্টি রাখছে সরকারের প্রতিটি সিদ্ধান্ত ও কর্মের উপর।

ইরানের বিপ্লবে স্বৈরাচারি শাহের হটানোর আন্দোলনে বামপন্থি, ইসলামপন্থি, জাতিয়তাবাদী সবাই একত্রে কাজ করেছিল। বিপ্লব-কালে প্রতিদেশে সেটাই হয়। কিন্তু বিপ্লবের দ্বিতীয় পর্যায়ে সবার স্ট্রাটেজী হয় ভিন্ন ভিন্ন, সবাই তখন নিজ ধারায় দেশকে নিয়ন্ত্রনে নিতে চায়। মিশর, তিউনিসায় এখন সে লড়াইটাই তীব্রতর হচ্ছে। কোন দেশের খুব কম সংখ্যক মানুষই কোন দলের সাথে জড়িত থাকে। অধিকাংশই নির্দলীয়। এই নির্দলীয় লোকদের কে কতটা কাছে টানতে পারে তার উপরেই নির্ভর করছে মধ্যপ্রাচ্যের বিপ্লবের ভবিষ্যৎ। ইরানে এ কাজে ইসলামপন্থিরা বিজয়ী হয়েছিল। তবে তারা কাছে টেনেছিল দলের সদস্য পদ বা ক্যাডার রূপে বরণ করার মধ্য দিয়ে নয়। ঐক্যের জন্য এটি কোন শর্তই ছিল না। যারা নির্দলীয় তারা দলীয় পরিচয়ে আনন্দ পায় না। বরং নিদর্লীয় পরিচযেই সর্বোচ্চ কোরবানী দিতে প্রস্তুত। এ অবধি যে শত শত লোক মধ্যপ্রাচ্যের বিপ্লবে নানা দেশে শহিদ হল তারা ক’জন দলীয় কর্মী? ইরানের বিপ্লবেও যে হাজার মানুষে প্রাণ দিয়েছিল তারাও কোন দলীয় ক্যাডার বা কর্মী ছিল? অনেকেই দল বা দলাদলিকে সমাধান নয, বরং সমস্যার কারণ মনে করে। তাই বিপ্লবের দেশগুলোতে জনগণের মাঝে একতা গড়তে হবে চেতনা রাজ্যে বিপ্লব এনে, দলীয় সদস্যপদ দিয়ে নিয়। যে কোন বিপ্লবের মূল শক্তি হল, জনগণের চেতনা রাজ্যের এ বিপ্লব। মধ্যপ্রাচ্যে ইসলামের মূল বিপক্ষ শক্তি হল সেক্যিউলারিস্টগণ। তাদের সাথে রয়েছে জাতিয়তাবাদী ও দেশের সামরিক বাহিনী। ফলে ইসলামের প্রতিপক্ষ অতি শক্তিশালী। তাদেরকে পরাজিত করতে হলে মূল লড়াই হতে হবে বুদ্ধিবৃত্তিক ময়দানে।

তাই মধ্যপ্রাচ্যে যে বিপ্লব শুরু হল তা কেবল বিপ্লবের শুরু মাত্র। বিপদসংকূল বহু পথ এখনও বাঁকি। এখন মূল কাজ আল্লাহর বিধানের পরিপূর্ণ বাস্তবায়নের। সে পথে প্রতিকদম এগুতে হবে লড়াই করে করে। ইসলামের প্রতিপক্ষ এক ইঞ্চি ভূমিও বিনাযুদ্ধে ছেড়ে দিবে না। তাছাড়া তাদের পিছনে রয়েছে মার্কিন নেতৃত্বাধীন বিশাল ইসলাম বিরোধী কোয়ালিশন। তাই ইসলামের বিজয় নিয়ে স্বপ্ন দেখা সহজ হলেও সে বিপ্লবের প্রচন্ড প্রসব বেদনা আছে। মুসলমানের

7 / 8

মধ্যপ্রাচ্যের বিপ্লবঃ শক্তি ও সম্ভাবনা

Written by ফিরোজ মাহবুব কামাল
Sunday, 27 March 2011 18:08 -

জীবনে সেটিই সবচেয়ে বড় পরীক্ষা। সে বেদনা সইবার সামর্থ সবার থাকে না। একারণেই অনেকে শুধু নামায-রোযা, হজ-যাকাত নিয়েই প্রচন্ড খুশী। কেউবা নিছক নামাযের তাবলীগ বা সুফীবাদে দীক্ষা নেয়াটাই মুসলমান রূপে বাঁচার জন্য যথার্থ মনে করে। ইসলামী রাষ্ট্র বিপ্লব ও আল্লাহর আইনের প্রতিষ্ঠা নিয়ে এদের কোন মাথা ব্যাথা নেই। একমাত্র কোরআনের জ্ঞান ও আল্লাহর পথে শহীদ হওয়ার প্রেরণাই ঈমানদারকে সে বেদনা নিয়ে অবিচল টিকে থাকার সামর্থ দিতে পারে। তখন আর তার কোন কিছু হারাবার ভয় থাকে না। সমগ্র সহায়-সম্পদ, এমন কি প্রাণ হারিয়েও নয়। এজন্যই একাজ নেহায়েত জিন্দা শহিদদের। ইসলামী বিপ্লবের এটিই দর্শনগত দিক। ইসলামী বিপ্লব আসে জিহাদের পথ বেয়ে, এখানে বিণিয়োগ ঘটে হাজার হাজার মোজাহিদের জান ও মালের। তাদের সে বিণিয়োগই পাল্টে দেয় দেশের রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, সংস্কৃতিসহ সব কিছু। যেদেশে সে বিণিয়োগ নাই সেখানে ইসলামী দল ও দলীয় ক্যাডারের সংখ্যা বাড়লেও বিপ্লব আসে না। বাংলাদেশ তারই এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

আরব দেশগুলির আলেম, বুদ্ধিজীবী ও লেখকদের দায়িত্বটি এ মুহুর্তে বিশাল। সে দায়িত্ব, ইসলামী জীবন দর্শন এবং সে সাথে বিপ্লবের দর্শন ও প্রক্রিয়াকে জনগণের চেতনা রাজ্যে প্রবল ভাবে প্রতিষ্ঠিত করার। একমাত্র তখনই ঘরে ঘরে জ্ঞানবান জিন্দা শহিদ গড়ে উঠে। তবে আরব বিশ্বে সে কাজটি যে প্রবল ভাবে হচ্ছে সে আলামতও প্রচুর। সেটি দেথা যায় জিহাদী প্রেরণা নিয়ে হাজার মানুষের ময়দানে নামা দেখে। বোঝা যায় তাহরীর ময়দান, তিউনিসিয়া, লিবিয়া ও ইয়েমেনের রাজপথে হিযাব পরিহিত মহিলা ও নামাযের আয়োজন দেখে। দেখা যায়, টিভি, ব্লগ ও ইন্টারনেটের আলোচনা দেখে। এরাই অতীতে বিপুল সংখ্যায় আফগানিস্তানে জিহাদের রণাঙ্গনে ছুটে গেছে। আর এখন প্রাণ দিচ্ছে নিজ দেশের রাজপথে। তাছাড়া একবার বিশ্ববিদ্যালয় খোলা হলে তা থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্তরা বেরুবেই। আর ইসলামের ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিশ্ববিদ্যালয় হল জিহাদের এ ময়দান। এখানে ঈমানদার সুযোগ পায় জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দর্শনটি শেখার। হাতে-কলমে শিক্ষার সে সুযোগটি বিশ্বের অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘটে না। এখানে সে পায় জীবনের মূল কম্পাস বা দিক নির্দেশনা। মোমেনের বাঁচার উদ্দেশ্য যে একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশে বাঁচা ও তার দ্বীনকে বিজয়ী করা –সেটিও সেখান থেকেই তার মনে বদ্ধমূল হয়। তখন সে ঈমানের বল পায় মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়ানোর। নবীজী (সাঃ)র আমলে সবচেয়ে মহৎ মানুষগুলো তো সৃষ্টি হয়েছে এরূপ বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই। নবীজী (সাঃ) ও তারা সাহাবাদের আমলে এমন বিশ্ববিদ্যালয় ছিল অসংখ্য। অথচ মুসলিম বিশ্বে এ বিশ্ববিদ্যালয় দীর্ঘকাল যাবত প্রতিষ্ঠাই পায়নি। আফগানিস্তানে সোভিয়েত আগ্রাসনের পর তেমনি এক বিশ্ববিদ্যালয়ের সূচনা হয়েছিল -যা এখন সমগ্র দক্ষিণ এশিয়ার রাজনীতিই পাল্টে দিচ্ছে। বিলুপ্ত করেছে একটি বিশ্বশক্তির। গলা চেপে ধরেছে আরেকটির। আশাপ্রদ দিক হল, সেরূপ বিশ্ববিদ্যায়ই আজ গড়ে উঠছে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে। তাই মধ্যপ্রাচ্যের বিপ্লব কোন দেশে কতটা সফলতা পাবে এখন সেটি সঠিক ভাবে বলা সম্ভব না হলেও এ কথা সঠিক ভাবেই বলা যায়, এ বিপ্লবগুলির ফলে ইসলাম তার বিজয়ের পথে বহুদূর এগিয়ে গেল। মধ্যপ্রাচ্যের বিপ্লবের শক্তি যেমন বিশাল, তেমনি এর সম্ভাবনাও। ২৭/৩/১১

8 / 8